

সাহিত্যের রূপ ও রীতি

হায়াৎ মামুদ

[লেখক-পরিচিতি : হায়াৎ মামুদ ২রা জুলাই ১৯৩৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মৌড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা গেজারিয়া অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁর পিতা মুহম্মদ শমসের আলী এবং মাতা আমিনা খাতুন। হায়াৎ মামুদ ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ হাইস্কুল থেকে ১৯৫৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে সন্মানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শেষে অবসর জীবন যাপন করছেন। কবিতা ও গল্প লেখা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে গবেষণা ও প্রবন্ধ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অর্ধশতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : স্বগত সংলাপ, প্রেম অপ্রেম নিয়ে বেঁচে আছি (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্রনাথ : কিশোর জীবনী, নজরুল ইসলাম : কিশোর জীবনী, প্রতিভার খেলা, নজরুল, বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, কিশোর বাংলা অভিধান ইত্যাদি। সাহিত্যক্ষেত্রে তৎপর্যপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হন।]

সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয়। আমরা সামগ্রিকভাবে ‘সাহিত্য’ বলি বটে, কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য, পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করি। সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বুঝে থাকি, যেমন— কবিতা, মহাকাব্য, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি। আর ‘রীতি’ হলো ঐ শাখাগুলো কীভাবে নির্মিত হয়েছে সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা।

কবিতা

ছন্দোবদ্ধ ভাষায়, অর্থাৎ পদ্যে, যা লিখিত হয় তাকেই আমরা ‘কবিতা’ বলে থাকি। কবিতার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো—মহাকাব্য ও গীতিকবিতা। বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের চূড়ান্ত সফল রূপ প্রকাশ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মেঘনাদ-বধ কাব্যে। মহাকাব্য রচিত হয় যুদ্ধবিগ্রহের কোনো কাহিনী অবলম্বন করে। ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সর্বপ্রাচীন দুটি কাহিনির একটি হলো রামায়ণ আর অন্যটি মহাভারত। মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—‘যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে’, এর অর্থ : মহাভারত গ্রন্থে যা নেই তা ভারতবর্ষেও নেই অর্থাৎ ভারতবর্ষে ঘটেনি বা ঘটতে পারে না। মহাভারত আয়তনে বিশাল। রামায়ণ তার তুলনায় ক্ষুদ্র; কাহিনি হলো : পত্নী সীতাকে নিয়ে যুবরাজ রামচন্দ্রের বনবাস, তাঁদের অনুগামী হয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ; বনবাসে থাকার সময়ে লক্ষ্মী দ্বীপের রাজা রাবণ তার বোন শূর্পণখার সম্মান রক্ষার জন্য সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় তার বাগানবাড়িতে বন্দি করে রাখে। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম ও রাবণের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটিই রামায়ণ-কথা। অর্থাৎ এককথা, মহাকাব্য হলো অতিশয় দীর্ঘ কাহিনি-কবিতা। মহাকাব্যের মূল লক্ষ্য গল্প বলা, তবে তাকে গদ্যে না লিখে পদ্যে লিখতে হয়। এর বাইরে আছে সংক্ষিপ্ত আকারের কবিতা, যা ‘গীতিকবিতা’ হিসেবে পরিচিত। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কিছু গান ও কবিতা রচনা করলেও তা তাঁর প্রধান সৃষ্টিকর্ম নয়। তিনি বলেছিলেন : ‘বক্তার

ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। গীতিকবিতা কবির অনুভূতির প্রকাশ হওয়ায় সাধারণত দীর্ঘকায় হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে যদি দীর্ঘও হয় তাতেও অসুবিধে নেই, যদি কবির মনের পূর্ণ অভিব্যক্তি সেখানে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতার আদি নিদর্শন বৈষ্ণব কবিতাবলি।

যদি গীতিকবিতাকে শ্রেণিবিভাজনের অন্তর্গত করতেই হয়, তাহলে এ রকম শ্রেণিবিভাগ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় : ভক্তিমূলক (যেমন- রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, রজনীকান্তের রচনা), স্বদেশপ্ৰীতিমূলক (যেমন- বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম', রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা-গান), প্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক চিন্তামূলক বা দর্শনাশ্রয়ী কবিতা। শোক-গাথা বা শোক আশ্রয় করে লিখিত কবিতাও এর সমপর্যায়ভুক্ত।

বাংলা কবিতায় বিশেষ দুটি ধারার জনক কাজী নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীন। প্রথম জন আমাদের সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' ও দ্বিতীয় জন 'পল্লিকবি' হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। নজরুলের কবিতায় যে উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর ও দৃঢ় ভাবের দেখা মেলে তা পূর্বে বাংলা কাব্যে ছিল না। জসীমউদ্দীনের নকশীকাঁথার মাঠ ও সোজনবাদিয়ার ঘাট জাতীয় কোনো কাব্য পূর্বে কেউ রচনা করেন নি এবং এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীও কেউ নেই।

নাটক

বিশ্বসাহিত্যে নাটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তবে মনে রাখা দরকার, নাটক সেকালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে (তখন তো ছাপাখানা ছিল না) ঘরে ঘরে পঠিত হতো না, নাটক অভিনীত হতো। নাটকের লক্ষ্য পাঠক নয়, নাটকের লক্ষ্য সর্বকালেই দর্শকসমাজ। তার কারণ সাহিত্যের সকল শাখার ভিতরে নাটকই একমাত্র যা সরাসরি সমাজকে ও পাঠকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে চায় এবং সক্ষমও হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ নাট্যসাহিত্যকে কাব্যসাহিত্যের মধ্যে গণ্য করেছেন। প্রাচীনকালে সে রকমই প্রথা ছিল। যেমন, শেক্সপীয়রও তাঁর সকল নাটক কবিতায় রচনা করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে কাব্য দুই ধরনের : দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। নাটক প্রধানত দৃশ্যকাব্য, সেহেতু নাটকের অভিনয় মানুষজনকে দর্শন করানো সম্ভবপর না হলে নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

নাটক সচরাচর পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত থাকে : ১. প্রারম্ভ, ২. প্রবাহ (অর্থাৎ কাহিনির অগ্রগতি), ৩. উৎকর্ষ বা Climax, ৪. গ্রহিণীমোচন (অর্থাৎ পরিণতির দিকে উত্তরণ), ৫. উপসংহার।

কাহিনীর বিষয়বস্তু ও পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নাটককে প্রধানত ট্রাজেডি (Tragedy বা বিয়োগান্ত নাটক), কমেডি (Comedy বা মিলনান্ত নাটক) এবং প্রহসন (Farce)- এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। এদের মধ্যে ট্রাজেডিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করা হয়। ট্রাজেডির ভিতরে দুইটি অংশ ক্রিয়াশীল থাকে : প্লট (Plot বা নাটকের আখ্যানভাগ), চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ, চিন্তা বা জীবনদর্শনের পরিস্ফুটন, মঞ্চায়ন, সমস্ত কিছুই সমন্বয়ে সুরসজ্জিত। গ্রিক দার্শনিক ও সাহিত্যবেত্তা এরিস্টোটল বলতে চেয়েছেন, রঙ্গমঞ্চের নায়ক বা নায়িকার জীবনকাহিনীর দৃশ্যপটম্পরা উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাটক দর্শকের হৃদয়ের ভয় ও করুণা প্রশমিত করে তার মনে করুণ রসের আনন্দ সৃষ্টি করে, তাই হলো ট্রাজেডি।

কমেডি বিষয়ে এরিস্টোটলের বক্তব্য এ রকম : মানবচরিত্রের যে কৌতুকপ্রদ দিক কাউকে পীড়ন করে না, ব্যথা দেয় না, হাস্যরস সৃষ্টি করে, তা-ই কমেডির উপজীব্য। এই কৌতুকের জন্য ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার, আকাজক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তিযোগের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের বা কথার সঙ্গে কাজের অসঙ্গতির মধ্যে। কমেডি আমাদের মানবসুলভ ক্রটিবিচ্যুতি ও নির্বুদ্ধিতার পরিণাম প্রদর্শন করে অশোভন দুর্বলতার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলে।

শ্রেণিবিন্যাসের বিবেচনায় নাটককে বহু শ্রেণিতে বিভক্ত করা সম্ভব। যেমন— ধ্রুপদী (বা ক্ল্যাসিক্যাল) নাটক, রোমান্টিক নাটক। অথবা ধরা যাক— কাব্যধর্মী নাটক, সামাজিক নাটক, চক্রান্তমূলক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন। এসব ব্যতিরেকেও হতে পারে গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, চরিত্রনাটক, উপন্যাসের নাট্যরূপ, সাংকেতিক নাটক, সমস্যাগ্রধান নাটক, একাঙ্কিকা ইত্যাদি। ট্র্যাজেডি ও কমেডি—মোটামুঠে এই দুইটি বিভাজন তো রয়েছেই।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম যুগান্তকারী প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র। মাইকেলের লেখনীতেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি, কমেডি ও প্রহসন বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়। তারপর দীনবন্ধু আবির্ভূত হন সামাজিক নাটক নিয়ে। তাঁর নীলদর্পণ নাটক এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) একইসঙ্গে নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। তিনি পৌরাণিক নাটক (জনা, বুদ্ধদেব) ঐতিহাসিক নাটক (কালাপাহাড়), সামাজিক নাটক (প্রফুল্ল) ইত্যাদি রচনা করেছেন।

এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) ঐতিহাসিক নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’ ও ‘শাজাহান’ বাঙালি দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়। তাঁর সমসাময়িকগণের মধ্যে অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উল্লেখযোগ্য। আর তার পরেই আবির্ভাব কবি রবীন্দ্রনাথের, যিনি বাংলা নাটকেরও মোড় ঘুরিয়ে দেন নানা দিকে : রক্তকরবী, ডাকঘর, অরূপরতন প্রতীকধর্মী নাটক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হয়ে রয়েছে।

ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় যা বলেছিলেন সে-কথাটি ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। তিনি লিখেছিলেন :

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
 নিতান্তই সহজ সরল
 সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
 তারি দুচারিটি অশ্রুজল।
 নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
 নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
 অন্তরে অতৃপ্তি রবে সঙ্গ করি মনে হবে
 শেষ হয়ে হইল না শেষ।

‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’-কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ-কথার ভিতরেই বলে দেওয়া হলো যে, ছোটগল্প কখনোই কাহিনির ভিতরে ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলে দেয় না- যেমনটা ঘটে উপন্যাসের ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে ‘ছোটগল্প’ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের বেশি নয়। তার পূর্বে শুধু ‘গল্প’ বলা হতো। বড়ো আকারের গল্প হলে ‘উপন্যাসিকা’ কথা চল ছিল, অর্থাৎ ছোট উপন্যাস। সাহিত্যের যত শাখা আছে, যেমন কাব্য মহাকাব্য নাটক উপন্যাস ইত্যাদি, সে-সবের মধ্যে ছোটগল্পই হচ্ছে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। ছোটগল্পেও থাকে উপন্যাসের মতোই কোনো-না-কোনো কাহিনির বর্ণনা, তবে তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নয়, কাহিনির ভিতরে থেকেই বেছে নেওয়া কোনো অংশ থাকে মাত্র।

ইংরেজি সাহিত্যের উদাহরণ অনুসরণ করে বাংলায় যেমন উপন্যাস লিখিত হয়েছে, ছোটগল্পেরও অনুপ্রেরণা এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই। ‘ছোটগল্প’ বলতে কোন ধরনের কাহিনি বোঝাবে সে বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ছোটগল্পকার এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) মনে করতেন আধ ঘণ্টা থেকে দু-এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ওঠা যায় এমন কাহিনিই ‘ছোটগল্প’। ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বলতেন যে ছোটগল্পের আয়তন এমন হওয়া সঙ্গত যেন ১০ থেকে ৫০ মিনিটের ভিতরে পড়া শেষ হয়। ইংরেজি ভাষায় পো-কে ছোটগল্পের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি লিখেছেন : In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design. ... undue brevity is just as exceptional here as in the poem, but undue length is yet more to be avoided.

বলাই বাহুল্য, উপন্যাসে যেমন বিস্তারিতভাবে কাহিনি বর্ণনা থাকে, ছোটগল্পের পরিধি ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপন সেখানে সম্ভব নয় এবং অপ্রয়োজনীয়ও বটে। সাহিত্য গবেষক শ্রীশচন্দ্র দাশ যথার্থই বলেছেন : ‘আসল কথা এই যে, ছোটগল্প আকারে ছোটো হইবে বলিয়া ইহাতে জীবনের পূর্ণাবয়ব আলোচনা থাকিতে পারে না, জীবনের খণ্ডাংশকে লেখক যখন রস-নিবিড় করিয়া ফুটাইতে পারেন, তখনই ইহার সার্থকতা। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে কেমনভাবে লেখকের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা তাহারই রূপায়ণ। আকারে ছোটো বলিয়া এখানে বহু ঘটনা-সমাবেশ বা বহু পাত্রপাত্রীর ভিড় সম্ভবপর নহে। ছোটগল্পের আরম্ভ ও উপসংহার নাটকীয় হওয়া চাই। সত্য কথা বলিতে কি, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কোথায় সমাপ্তির রেখা টানিতে হইবে, এই শিল্পদৃষ্টি যাহার নাই তাহার পক্ষে ছোটগল্প লেখা লাঞ্ছনা বই কিছুই নহে।’ বাংলা ভাষায় সার্থক ছোটগল্পকারের অনন্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে ছোটগল্প বহুপ্রকার হতে পারে। সাধারণত শ্রেণিবিভাগ হিসেবে এগুলোকে উল্লেখ করা যায় : ১. প্রেমবিষয়ক, ২. সামাজিক, ৩. প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে, ৪. অতিপ্রাকৃত কাহিনী, ৫. হাস্যরসাত্মক, ৬. উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ী, ৭. সাংকেতিক বা প্রতীকধর্মী, ৮. ঐতিহাসিক, ৯. বিজ্ঞানভিত্তিক, ১০. গার্হস্থ্য বিষয়ক, ১১. মনস্তাত্ত্বিক, ১২. মনুষ্যতর প্রাণিজগৎ, ১৩. বাস্তবনিষ্ঠ, ১৪. গোয়েন্দাকাহিনী বা ডিটেকটিভ গল্প, ১৫. বিদেশি পটভূমিকায় রচিত গল্প।

আমাদের জন্য গর্বের বিষয় এটাই যে, বাংলা ভাষায় উপরোক্ত সব ক’টি শ্রেণির গল্পই বাঙালি গল্পলেখকবৃন্দ লিখে গেছেন ও এখনো লিখছেন।

উপন্যাস

সাহিত্যের শাখা-প্রশাখার মধ্যে উপন্যাস অন্যতম। শুধু তাই নয়, পাঠক সমাজে উপন্যাসই সর্বাধিক বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। উপন্যাসে কোনো একটি কাহিনি বর্ণিত হয়ে থাকে এবং কাহিনিটি গদ্যে লিখিত হয়। কিন্তু পূর্বে এমন এক সময় ছিল যখন কাহিনি পদ্যে লেখা হতো; তখন অবশ্য তাকে উপন্যাস বলা হত না। যেমন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সব ধরনের মঙ্গলকাব্যই ছন্দে রচিত এবং তাতে গল্প বা কাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে, তবু তাকে উপন্যাস না বলে কাব্যই বলা হতো—যেহেতু কবিতার ন্যায় তা ছন্দে রচিত হয়েছে। উপন্যাস রচিত হয় গদ্যভাষায়, এই তথ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছন্দোবদ্ধ রচনার অনেক পরে যেহেতু গদ্যের আবির্ভাব তাই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গদ্যে কাহিনী লেখা হয়েছে, যেমন— গল্প বা ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যকাহিনি ইত্যাদি। উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলো প্লট (Plot)। ঐ প্লট বা আখ্যানভাগ তৈরি হয়ে ওঠে গল্প ও তার ভিতরে উপস্থিত বিভিন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ও কালজয়ী (এবং অনেকের মতে এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকের পূর্বে বাংলায় কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি। ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্কিম উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাঁর কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি কালজয়ী কথাসাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে মহৎ ঔপন্যাসিক বলতে আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বুঝি। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পৃথিবীতে যেখানে যত বাঙালি রয়েছে তাদের ভিতরে শরৎচন্দ্রই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি পঠিত ও জনপ্রিয়।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে অবশ্য তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সমরেশ বসু, শহীদুল্লা কায়সার, আবু ইসহাক, মাহমুদুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ বিভিন্ন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। উপন্যাস বহু রকমের হতে পারে। যেমন— ঐতিহাসিক উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, মনোবিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁরই মতো বহু ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রচনা করেছিলেন— যেমন মাধবী-কঙ্কণ, রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাত্রি-জীবনপ্রভাত ইত্যাদি।

তবে তাঁর সমসাময়িক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেভাবে বাঙালি পাঠকসমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে জয় করে নেন, তার সমকক্ষ আর কাউকে দেখা যায় না।

প্রবন্ধ

আমরা সকলেই অস্পষ্টভাবে বুঝি ‘প্রবন্ধ’ কাকে বলে বা কী রকম। গদ্যে লিখিত এমন রচনা যার উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণাকে পরিতৃপ্ত করা। কোনো সন্দেহ নেই, এ জাতীয় লেখায় তথ্যের প্রাধান্য থাকবে যার ফলে অজ্ঞাত তথ্যাদি পাঠক জানতে পারবে। ধরা যাক, সংবাদপত্রের যাবতীয় খবরাখবর-দেশের, বিদেশের, মহাকাশের ইত্যাদি। সবই গদ্য ভাষায় রচিত এবং যার লক্ষ্য পাঠকের অজানা বিষয় পাঠককে জানানো। গদ্যসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও তথ্যবহুল রচনা হলেই তাকে

প্রবন্ধসাহিত্যের উদাহরণরূপে গণ্য করা চলবে না, যদি-না লেখাটি সাহিত্য পদবাচ্য হয়। সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ সৃজনশীলতা। লেখকের সৃজনশীলতার কোনো পরিচয় যদি পরিস্ফুটিত না হয়, তো তেমন কোনো লেখাকে প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণযুক্ত বলা যাবে না। এ-কারণে খবরের কাগজে প্রকাশিত সমস্ত লেখাই গদ্যে রচিত হলেও তাদেরকে প্রবন্ধসাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত নয়। তাহলে তো জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত সকল রচনাই প্রবন্ধসাহিত্য বলে গণ্য হতে পারত। তা না হওয়ার কারণ ঐ সৃজনশীলতার অভাব।

মনে রাখা প্রয়োজন : সাহিত্যের যা চিরন্তন উদ্দেশ্য— সৌন্দর্যসৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধের সেই একই উদ্দেশ্য। সাধারণত কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি করেন তাকেই ‘প্রবন্ধ’ নামে অভিহিত করা হয়। প্রবন্ধের ভাষা ও দৈর্ঘ্য নানা রকম হতে পারে ঠিকই, তবে তা গদ্যে ও নাতিদীর্ঘ আকারে লিখিত হয়।

প্রবন্ধের দুটি মুখ্য শ্রেণিবিভাগ আছে : তন্ময় (objective) প্রবন্ধ ও মন্বয় (subjective) প্রবন্ধ। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করে যে-সকল বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখিত হয় সেগুলোকে তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলে। এ ধরনের প্রবন্ধ কোনো সুনির্দিষ্ট সুচিন্তিত চৌহদ্দি বা সীমারেখার মধ্যে আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত চিন্তাপ্রধান সৃষ্টি। এ জাতীয় রচনায় লেখকের পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয়ই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

আরেক শ্রেণির রচনাও সম্ভব যেখানে লেখকের মেধাশক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিত্বই প্রধান হয়ে ওঠে। এদেরকে মন্বয় প্রবন্ধ বলে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ এই পর্যায়ে। ফরাসি ভাষায় বেল্ লেত্র (belle letre) বলে একটি শব্দ আছে, ইংরেজিতেও বেল্ লেত্রই বলে। এর বাংলা নেই। বাংলায় বলা যেতে পারে চারুকথন। বেল্ শব্দের অর্থ—সুন্দর, চমৎকার। আর লেত্র অর্থ— letter, অক্ষর। বেল্ লেত্র মন্বয় প্রবন্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ বইটির সকল রচনাই এ জাতীয় মন্বয় প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। অনেকে এ ধরনের লেখাকে ‘ব্যক্তিগত প্রবন্ধ’ বলারও পক্ষপাতী। ‘রম্য রচনা’ নামে একটা কথা অনেক দিন যাবত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বোঝাতে চালু হলেও দুটি একজাতীয় লেখা নয়। বেল্-লেত্র বোঝাতে ‘রম্য রচনা’ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ ‘রম্য রচনা’ শব্দদ্বয়ের ‘রম্য’ শব্দের ভিতরে এমন ইঙ্গিত রয়ে যায় যে, লেখাটি সিরিয়াস বা গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে নয়, অথচ রম্যরচনার বিষয় খুবই গুরুগম্ভীর হতে পারে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা গুরুগম্ভীর হলে চলবে না।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধসাহিত্য আয়তনে বিশাল এবং গুণগত মানে অতি উত্তম। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে অদ্যাবধি তার প্রবহমানতা কখনো ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। □

শব্দার্থ ও টীকা : মেঘনাদ-বধ কাব্য – কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। রামায়ণ– প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। মহাভারত– প্রাচীন ভারতবর্ষে রচিত মহাকাব্য। যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে– যা মহাভারতে নেই তা ভারতবর্ষের কোথাও নেই– এমন বোঝানো হয়েছে। লঙ্কা দ্বীপ–সিংহল দ্বীপ, বর্তমান নাম শ্রীলঙ্কা। অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)– জন্ম ঢাকায় ১৮৭১-এর ২০শে অক্টোবর এবং মৃত্যু লখনৌ শহরে ১৯৩৪ সালের ২৬শে আগস্ট। ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্যারিস্টারি পাস করে স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেন। সংগীত রচনার জন্য বাঙালির সংস্কৃতিজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর ভক্তিগীতি ও দেশাত্মবোধক গান অদ্যাবধি জনপ্রিয়। অবুগরতন– রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ (১৮৬৬-১৯৪৬) : ইংরেজি ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর স্রষ্টা। একাক্ষিকা– এক অঙ্কের নাটককে বলা হয়। এডগার্স অ্যালান পো (১৮০৯-৪৯)– আমেরিকার কবি, গল্পকার ও সমালোচক। এরিস্টোটল্‌ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ)– গ্রিক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও সাহিত্য সমালোচক, দার্শনিক প্লেটোর শিষ্য ছিলেন। কপালকুণ্ডলা– ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস, উপন্যাসের নামকরণ হয়েছে নায়িকার নামে। কালাপাহাড়– একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। হিন্দুধর্মবিদ্বেষী এক সেনাপতি, দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)– বাংলা নাটকের যুগন্ধর পুরুষ। নাট্যরচনার পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন। অভিনেতা হিসেবেও অভূতপূর্ব সুনাম অর্জন করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত– প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত নৃপতি, রাজত্বকাল ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দ, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) বিখ্যাত নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’ ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস; জনা– পৌরাণিক নাটক। ডাকঘর– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত নাটক। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩)– কবি, নাট্যকার ও সংগীত রচয়িতা, তাঁর ‘শাজাহান’ ও ‘চন্দ্রগুপ্ত’ অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক; দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)– বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগস্রষ্টা লেখক, ‘নীলদর্পণ’ তাঁর সর্বাধিক খ্যাত নাটক, ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, ‘সধবার একাদশী’ তাঁর বিখ্যাত প্রহসন। রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)– সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)– কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম বাঙালি কমিশনার। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, জীবন-প্রভাত, জীবন-সন্ধ্যা, সংসার, সমাজ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, ‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’ রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস; রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)– পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক ও বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত। বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের শিল্পী। বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, গৌড়ীয় ব্যাকরণ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)– আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। দৃশ্যকাব্য– প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়ে থাকে। নকশীকাঁথার মাঠ– পল্লিকবি জসীম উদ্দীন রচিত আখ্যান কাব্য। নীলদর্পণ– দীনবন্ধু মিত্রের নাটক, দেশের তৎকালীন শাসনকর্তা ব্রিটিশদের হুকুমে বাধ্যতামূলক নীলচাষ করানোর সমালোচনা করে এই নাটক রচিত হয়েছিল। পৌরাণিক নাটক– ভারতবর্ষীয় পুরাণের কোনো কাহিনী অবলম্বনে রচিত

নাটক। **প্রফুল্ল**— নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা নাটক। **প্রহসন**— উপন্যাস বা নাটকের রচনামূলক অবলম্বনে হাস্যরসাত্মক রচনা। **পুট**— গল্প উপন্যাস নাটকের কাহিনী অংশকে পুট বলা হয়। **বনফুল**— গল্পকার ও উপন্যাসিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বা লেখক নাম। **বন্দে মাতরম**— এই দু শব্দের অর্থ জননীকে অর্থাৎ মাকে বন্দনা করি, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে স্বরচিত এই গানটি যুক্ত করেছেন। **বিচিত্র প্রবন্ধ**— রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি প্রবন্ধ সংকলনগ্রন্থ। **বিষবৃক্ষ**— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। **বুদ্ধদেব**— পৌরাণিক নাটক। **বৈষ্ণব কবিতা**— প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত গীতিকবিতা ও গান। **মঙ্গলকাব্য**— বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত এক ধরনের কাহিনী-কাব্য। **মহাভারত**— প্রাচীন ভারতবর্ষে দুটি মহাকাব্যের একটি, অন্যটি রামায়ণ, মূল রচনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল, কয়েকশত বৎসর পরে বাংলায় অনূদিত হয়। **মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত**— উনিশ শতকের উপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। **মাধবীকঙ্কণ**— রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত উপন্যাস। **মেঘনাদবধ কাব্য**— কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) রচিত আধুনিক বাংলা মহাকাব্য। **রক্তকরবী**— রবীন্দ্রনাথ রচিত সাংকেতিক নাটক। **রাজপুত জীবনসন্ধ্যা**— রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। **রামপ্রসাদ সেন (আনু: ১৭২৩-৮১)** কবি ও সংগীত রচয়িতা, ভক্তিগীতি রচনার জন্য বিখ্যাত, ঐর গানকে ‘রামপ্রসাদী’ আখ্যা দেওয়া হয়। **শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৭-৭১)**— ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শহিদ হন। **শাজাহান**— নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত নাটক। **শূর্ণপাখা**— রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনীতে লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। **শেখরপীয়ার**— (১৫৬৪-১৬১৬) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। **শ্রব্যকাব্য**— যে কাব্য পড়া ও শোনার জন্য রচিত, এর বিপরীতে রয়েছে দৃশ্যকাব্য; **শ্রীশচন্দ্র দাস**— ‘সাহিত্য সন্দর্শন’ গ্রন্থের রচয়িতা, বইটি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (যেমন গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাগ্রন্থ। **সংস্কৃত আলঙ্কারিকবন্দ**— প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পুরনো আমলে যাঁরা আলোচনা করেছেন, বইপত্র লিখেছেন। **সীতা**— পৌরাণিক চরিত্র, রামচন্দ্রের স্ত্রী, লঙ্কার রাজা রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যায়। তার ফলে রাবণের বিরুদ্ধে রাম যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক ‘সীতা’ ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। **সোজনবাদিয়ার ঘাট**— পল্লিকবি জসীম উদ্দীন রচিত কাহিনীকাব্য। **হাসান আজিজুল হক**— জন্ম ১৯৩৯ সালে, বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসিঙ্গী

পাঠ-পরিচিতি : সাহিত্য নানা ধরনের। অনেক রকম উদ্ভিদ নিয়ে যেমন বাগান তেমনি বিভিন্ন রকম সৃষ্টিকর্ম নিয়ে সাহিত্য। ‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে বিচিত্র সাহিত্যরীতির পরিচয় আছে। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে সাহিত্যের জগৎ। আবার প্রত্যেকটির কিছু শাখা-প্রশাখা আছে। ‘সাহিত্যের রূপ ও রীতি’ প্রবন্ধে সাহিত্যের এই সব রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা, নাটক, ছোটগল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি উপ-শিরোনামে লেখক প্রত্যেকটি রীতির স্বরূপ চারিত্র্য তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটি মূলত বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যের আলোকে সাহিত্যের রূপ, রীতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা দেয়, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য পাঠে আমাদের উৎসাহিত করে।

অনুশীলনী

কর্ম-অনুশীলন

- ১। বাম পাশে সাহিত্যের বিভিন্নশাখা ও ডান পাশে সংক্ষেপে তার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দাও।
- ২। তুমি নিজে (স্বরচিত) একটি কবিতা লিখে শিক্ষককে দাও।
- ৩। নিজেদের লেখায় সমৃদ্ধ একটি ‘দৈয়ালিকা’ প্রকাশ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। ‘যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে’- মন্তব্যটি কোনটি সম্পর্কে?

ক. গীতিকবিতা	খ. ছোটগল্প
গ. মহাকাব্য	ঘ. কাহিনীকাব্য
- ২। ‘পাঠক সমাজে উপন্যাস সাহিত্য বহুল পঠিত ও জনপ্রিয়।’ কারণ উপন্যাস-
 - i সহজ-সরল-প্রাঞ্জল
 - ii পাঠক নিজেকে খুঁজে পায়
 - iii এখানে সমাজ দেশ ও জাতির প্রতিফলন ঘটে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

- ৩। ‘গল্পপাঠ শেষ করেও পাঠক কাহিনীর সমাপ্তি খোঁজে’ বক্তব্যটি ধারণ করে যে পঙ্ক্তি-
 - i ঘটনার ঘনঘটা
 - ii শেষ হয়ে হইল না শেষ
 - iii অন্তরে অতৃপ্তি রবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

- ৪। জীবনের পূর্ণাবয়ব নয়, খণ্ডাংশকে লেখক রস-নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলেন। জীবনের কোনো একটি বিশেষ মুহূর্ত কোনো বিশেষ পরিবেশের মধ্যে— স্বল্পসংখ্যক চরিত্রের মাধ্যমে এর পরিণতি ঘটে।

উদ্দীপকে সাহিত্যের কোন শাখার পরিচয় ফুটে উঠেছে?

- | | |
|------------|------------|
| ক. কবিতা | খ. ছোটগল্প |
| গ. উপন্যাস | ঘ. নাটক |

সৃজনশীল প্রশ্ন

কাহিনীর উৎস পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা, আয়তনে বিশাল। কাহিনী বিভিন্ন সর্গে বা পর্বে বিভক্ত থাকে, সাধারণত পদ্যে রচিত হয় তবে গদ্যেও হতে পারে। এর নায়ক হবে বীর, প্রভাবশালী, আপসহীন দৃঢ়চেতা। কাহিনীর উত্থান-পতন থাকবে।

- ক. সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ কোনটি?
- খ. নাটককে দৃশ্য কাব্য ও শব্দকাব্য বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকের বক্তব্যে 'সাহিত্যে রূপ ও রীতি' রচনার সাহিত্যের কোন শাখার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই সাহিত্যের একমাত্র দিক নয় বরং এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত।' মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।